সেই সব কোকিলেরা

অমর ভট্টাচার্য

সময়টা ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ বাধা পেলাম সামনের এক দীর্ঘ আঁকাবাঁকা মানুষের লাইনে। সামনের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম 'খোকা এটা কিসের লাইন?' কলেজে অ্যাডমিশনের ফর্ম দিচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে আরো কিছু কথা বলার পর হঠাৎ সেই ছেলেটি কণ মুখে বলল — সকাল থেকে লাইন দিয়েছি — আটশো তেরো এগ্রিগেট। ভর্তি হতে পারব তো?

প্রায় সাড়ে তিন দশক পেরিয়ে এসেছি। ব্যবধান হয়ে গেছে এক প্রজন্মের। একান্তভাবে ছাত্রদের কোনো দাবি নয়। সর্বসাধারণের দাবি নিয়েই সেদিন রাস্তায় পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছাত্রসমাজ। সময়টা ১৯৬৬'র ফ্রেব্রুয়ারি মাস। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দেশে প্রচণ্ড খাদ্য-সংকটের সমাধান হিসাবে সরকারি খাদ্য সংগ্রহের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল পনেরো লক্ষ টন চাল সংগ্রহের। মনে হয়েছিল মার্কিনি দান পি.এল.-৪৮০'র গম আর এই সংগৃহীত চাল দিয়েই হয়ত এই খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। গ্রামাঞ্চলের বড় বড় জোতদারেরা সরকারি লেভির চাল ফাঁকি দিয়ে তা মজুত ও অধিক দামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতে লাগল আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষ রইল অর্ধাহারে, অনাহারে। লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হল সরকার। খাদ্যের দাবিতে রাস্তায় নামলো জনতা।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬। বসিরহাটে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল জনতার সঙ্গে পুলিশের। পুলিশের গুলিতে আহত হলেন ৬ জন। পরের দিন অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি বসিরহাট মহকুমার স্বরূপগঞ্জে মিছিলে শামিল হন এলাকার স্কুল কলেজের ছাত্র-যুবকেরা। বিক্ষোভ চলাকালীন হঠাৎ পুলিশ গুলি চালাতে লাগল। নিহত হলেন তেঁতুলিয়া মালটিপারপাস হাই স্কুলের ছাত্র নুল ইসলাম আর গুতর আহত হলেন একই স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র মণীন্দ্র বিশ্বাস। ১৮ ফেব্রুয়ারি এ খবর প্রকাশিত হবার পর বাংলাজুড়ে উত্তাল হয়ে উঠল ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ। গণ-শিল্পীরা গান বাঁধলেন — শপথ নিলাম শপথ নিলাপ প্রাণ দেব বলিদান/বাংলা মায়ের প্রথম শহিদ নুল ইসলাম, রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির গেটে গর্জে উঠল ছাত্ররা। এই ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই বাংলার ছাত্রনেতারা এই আন্দোলনকে বাঁধলেন এক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়। গঠিত হল সারা বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি। তার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই পালন করা হল সর্বাত্মক হরতাল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে এই সময় ১১মার্চ, ১৯৬৬-তে আগরপাড়ার তেঁতুলতলার বাসষ্ট্যান্ডে মিলিটারির গুলিতে মারা যান একজন অ্যাংলো শিশু সহ ১১ জন মানুষ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনে। হাবড়া, অশোকনগর, বসিরহাট, বনগাঁয় আক্রান্ত হতে লাগল সরকারি ভবন। ক্রুদ্ধ জনতা ছাই করে দিলেন বনগাঁর সরকারি খাদ্য দপ্তরের ভবন। হাবড়ার সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন আলি হাফেজ, আহত কালু মণ্ডল মারা গেলেন হাসপাতালে। চবিবশ পরগণা থেকে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায়। মার্চের ৪ তারিখে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে আবার নিহত হলেন ছাত্র সতেরো বছরের আনন্দ হাইত। ছাত্রদের এই চেতনাই ৬০-এর দশকে "ভয়েস অফ আমেরিকা"র সাথে ভারত সরকারের চুক্তিমত চবিবশ পরগনার বাইপুরে যে ট্রান্সমিটার বসানোর কথা ছিল তা বাতিল করতে বাধ্য করে সরকারকে। চুক্তিমত আমেরিকা প্রচারদপ্তর কেবল একঘন্টা করে এই কেন্দ্র থেকে তাদের প্রচার চালাবেন এবং বাকি সময় এটি ব্যবহার করবেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। ছাত্রসমাজ সেদিনও এই

অবমাননাকর চুক্তির বিদ্ধে লড়েছিলেন ও তাদের দাবী ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের কুখ্যাত মদতদাতা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান ম্যাকনামারাকে দমদম এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করতে দেয়নি উদ্দাম ছাত্রদের সোনালী যৌবন। ১৯৬৬ সাল, সমস্ত দুনিয়াই যেন তখন বিদ্রোহে ফেটে পড়ছে। ফ্রান্স কিংবা আমেরিকা, ভিয়েতনাম কিংবা বর্মা সর্বত্রই তণরা উদ্বেল হয়ে উঠছে পুরাতনকে ধবংস করার নেশায়, অন্যায়কে প্রতিরোধের মেজাজে। ফ্রান্সে সে বিশ্ববিদ্য ালয় দখল করে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে, আমেরিকায় তার রূপ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিদ্ধে। সেখানে তারা সৈন্যবা হিনীতে যোগ দেবার আবেদনপত্র পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। শত্রু অধিকৃত ভিয়েতনামে সে বুক পেতে দেয় ইয়াঙ্কিদের র াইফেলের সামনে। জাপানে ওয়াকিনাওয়ার মাটিতে মার্কিন হাওয়াই আড্ডা বন্ধের দাবিতে সে মিছিল করে। আর পশ্চি মবঙ্গে সে যৌবন আত্মপ্রকাশ করে খাদ্যের দাবিতে, জনতার মিছিলে বুক পেতে গুলি নেওয়া আনন্দ হাইত আর নুল ইসলাম হয়ে।

'৭০-এর দশকে যে ছাত্র সমাজকে দেখেছি ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, ইউনিভার্সিটি ত্যাগ করে গ্রামে কৃষকদের কাছে চলে যেতে। যে স্কুল-কলেজে ভর্তির জন্য লালায়িত এখনকার অনেকেই, তারা সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সেদিন ত্যাগ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, আর্কাদি গাইদার একবার তার সাহিত্য সম্বন্ধে বলেছিলেন — তার সা হিত্য সৃষ্টির পেছনে তিনি নন, আসলে সময়টাই ছিল সেইরকম। তাঁর উক্তির সময়টা মানে শ বিপ্লব — ১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লবের সময়। ছাত্ররা দেশে লড়ে, মরে আবার উঠে দাঁড়ায়। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে যে সুহার্তো নামের সামরিক একনায়ক ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন, বত্রিশ বছর বাদে সে দেশের উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ তাকেই টেনে নামাল তার কলঙ্কিত সিংহাসন থেকে। এতসব কথা যা এতক্ষণ বললাম তা আমার ধান ভানতে শিবের গীতের মত কিনা জানিনা, কেননা, পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী আম াকে চীনের ছাত্র আন্দোলনের উপর লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হল দেশ, কাল ভৌগলিক সীমারেখার অ াকৃতি, বর্ণ, ভেদ বিশেষে ছাত্রদের যে ঐক্য তা হচ্ছে, তাদের 'স্পিরিট'-এ, তাদের স্বার্থহীনতায়, তাদের সুন্দর আবেগের উদ্বেলতায়।

এবার তা হলে চলে যাই চীনের ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সাম্প্রতিক কালের চীন আবার খবরের শিরোনামে এসেছে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ-এর বিতর্কের ঝড় তোলা 'চীন ভারতের পয়লা নম্বর শত্রু' — এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে।

চীন কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক লঙমার্চ থেকে ১৯৪৯-এ ক্ষমতা দখল, '৫৯-এ তিববত প্রসঙ্গ, '৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধ, '৬৭-'৬৮-তে সাংস্কৃতিক বিপ্লব তথা সিপিআই (এমএল)-কে সমর্থন এবং '৭৬-এর মার্ত্তহীন বারবারই সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দেশের রাজনীতির সঙ্গে।

চীনের ছাত্র-আন্দোলন এবং শেষমেষ ছাত্রদের উপর চীনা ফৌজের গুলিচালনা সমস্ত বিশ্ব তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সমস্ত সংগঠন ও দেশ হয় এই গুলিচালনার বিরোধিতা করেছে, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, না হয় বলেছে চীনা ফৌজ পরিস্থিতির জন্য বাধ্য হয়েছে গুলি চালাতে, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে শুধু এই ঘটনাকে ধিক্কার বা সমর্থন নয় আসলে এখন সংবাদ শিল্প এবং বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে কমিউনিজমের মতাদর্শ।

আসুন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেখি। ২৪শে এপ্রিল (১৯৮৯) থেকে শু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের পর ২৯ এপ্রিল — স্টেট কাউন্সিল ও পিকিং মিউনিসিপ্যালিটির পদাধিকারীদের সঙ্গে ১৬টি কলেজের ৪৫জন ছাত্রের এক আলোচনা চলে।

ঠিক দুদিন আগে প্রায় ৩০,০০০ ছাত্র 'ইন্টারন্যাশানাল' সংগীত গেয়ে পিকিং-এর প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। চীনের নিজস্ব সংবাদে দেখা যায় এই সময় ছাত্রদের স্লোগান ছিল 'কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন কন'', ''প্রধান চার নীতিকে সমর্থন কন'', ''সরকারের সুবিধাভোগীর ধবংস হোক'', ''দুর্নীতি হঠাও'' ইত্যাদি স্লোগান (পিকিং রিভিউVol.-32, No.-20) । এরপর ৪ মে আন্দোলনের ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ৩ মে চীনা পার্টির সাধারণ সম্পাদক ঝাও জিয়াং ছাত্রদের সামনে যে রাজনৈতিক লাইনের কথা তুলে ধরেন তা হচ্ছে ১৯৭৮-এ অনুষ্ঠিত চীনা পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণ াঙ্গ অধিবেশনের লাইন। ঝাও তখন অবধি ছাত্রদের উপর আস্থা রাখছেন এবং ছাত্ররাও তার কথামতো ৫ মে থেকে ষ্ট্র

াইক বন্ধ করে ক্লাসে যোগদান করছে (পিকিং রিভিউ Vol.-3, No.-20) । এরপর ১৯ মে পিকিং-এ সামরিক শাসন জারি করা হয়।

কিন্তু May 29 -এর Beijing Review ঘোষণা করে — Martial Law : Declared But not Enforced (সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োগ করা হয়নি)। ঐ একই সংখ্যায় চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেং-এর ভাষণ রয়েছে এবং তিনি বলেছেন : Strong measures Declared to Curb 'Turmoil' (বিক্ষোভ দমনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হল) । এই বক্তৃতায় লি পেং একটা পরিষ্কার লাইন টেনেছিল এই বলে ঃ "They concentrate their attack on comrade Deng Xiaoping, who has made great contributions to China's reform."

এরপরের ঘটনা সবারই জানা। চীনা সৈন্য তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে ঢুকে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায়। বেসরকারি হিসেবে তিন হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত মৃত। আর আহত হয়েছে তার অন্তত তিনগুণ। সারা বিশ্ব এবং বিভিন্ন সংগঠন তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে হয় চীনা সরকারের সমর্থনে না হয় চীনা ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বনে।

আজকের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যেমন একদিনে অধঃপতিত হয়নি তেমন স্ট্যাচু অব লিবার্টির মূর্তিও গড়ে ওঠেনি একদিনে। তাই সেদিনের ঘটনার বীজ খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে চীনা পার্টির অতীতে। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুই মতাদর্শের সংগ্রামের কথা আমরা জানি। ক্ষমতা দখলের আগের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখতে পাব ক্ষমতা দখলের পর চীনের ভেতরকার দুই লাইনের সংগ্রাম কত আঁকা-বাঁকা পথেই না এগিয়েছে। আজকের চীনা শাসক গোষ্ঠীর জয়যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াওকে ক্যু করে হত্যার মধ্য দিয়ে।

চীনা পার্টিতে চেয়ারম্যান মাও সে তুং-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী সদর দপ্তর যার সৈনিকেরা ছিলেন চিয়াং চিং, লিন পিয়াও, ইয়েচুন, চেন পো তা প্রমুখ ব্যক্তিরা আর অপর দিকে লিউ শাও চি, পেং চেন, চৌ এন লাই, তেং শিয়াও পিং প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া দপ্তর। এই বুর্জোয়া দপ্তর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সব দিক থেকেই সর্বহারা দপ্তরকে বিধ্বস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে।

১৯৬০ সালের প্রথম ভাগে লিও শাওচি, তেং শিয়াও পিং দপ্তর শিল্প-সাহিত্য ফ্রন্টে মাও-সে-তুং চিন্তাধারাকে আক্রমণ করে প্রচার করা শুরু করে মাও-সে-তুং এটা দেখিয়েছিলেন ক্ষমতা দখল করতে হলে অবশ্যই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করতে হবে। এটা বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রে যেমন সত্য প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য।

১৯৬০-এ লিও-শাও-চি-দের ঘনিষ্ঠ পিকিং এর ডেপুটি মেয়র উ-হান মাও-সে-তুংকে আঘাত করে লিখেছিলেন, 'হাই-জুই সম্রাটকে তিরস্কার করে।' এবং এই নাটকের পরিশিষ্ট হিসেবে দ্বিতীয় নাটকে লেখেন, 'দপ্তর থেকে বরখাস্ত হলেন দাই-জুন।' এই দুটি নাটককে নেপথ্যে সহযোগিতা করেন তৎকালীন প্রচার অধিকর্তা, পলিটব্যুরোর সদস্য লু তিৎ-ই।

স্মরণ করা যেতে পারে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় দুটি নাটককেই ছাত্র যুবদের তীব্র সমালোচনার মুখে বন্ধ করে দিতে হয়।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে লিউ-শাও-চি-দের ঘনিষ্ঠ পেং-চেং-কে কেন্দ্রীয় কমিটির দশম বর্ধিত অধিবেশনে মাও-বিরোধী এক দীর্ঘ দলিল পেশ করে। এই সভায় পেং-চেং-কে সমর্থন করেন তৎকালীন পার্টির সাধারণ সম্পাদক তেং-শিয়াং-পিং এবং সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থাপক প্রধান ওয়াং-কে-চেং। চীনা পার্টির এই অধিবেশনেও মাও বলেছিলেন, "একটি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করতে হলে সর্বদাই জনমত সৃষ্টি করা, আদর্শক্ষেত্রে কাজ করা দরকার।" এ-কথা বিপ্লবী শ্রেণীর ক্ষেত্রে যেমন সত্য প্রতি-বিপ্লবী শ্রেণীর ক্ষেত্রেও তেমন সত্য" — এই মতাদর্শগত প্রস্তুতিই চালাচ্ছিল চীনা পার্টির মধ্যাকার পুঁজিবাদের পথ অনুগামী ব্যক্তিরা। কমরেড লিন পিয়াও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হবার পরই গণমুক্তি ফৌজের শুদ্ধিকরণ ও মাও চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচারের কাজ শুরু করেন। শিল্প-সাহিত্য ফ্রন্টে মাও ও মাও-বিরোধী চিন্তাধারার ভেতরকার সংগ্রামের এক অবশ্যম্ভাবী ফল হল মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই বিপ্লব সম্পর্কে চীনা পার্টির কংগ্রেসে তাই বলা হয়েছিল — "এটা হচ্ছে উপরি কাঠামোর ক্ষেত্রের একটি মহান বিপ্লব।" আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংশোধনবাদকে চুরমার করা, ক্ষমতার যে অংশটা বুর্জোয়া শ্রেণী কুক্ষিগত করে নিয়েছিল তা আবার কেড়ে নেওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ উপরি কাঠামোর মধ্যে সামগ্রিকভাবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রবর্তন করা এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা যাতে আমাদের যে অব্যাহতভাবে সমাজতন্ত্রের পথ বেয়ে বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলবে তার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়।

'হাই-জুই-এর পদত্যাগ' নাটককে কেন্দ্র করে পেং চেন কেন্দ্রীয় কমিটির অজ্ঞাতসারে 'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সমস্যা' নামে এক সার্কুলার প্রচার করে বলেছিলেন নাটকটি হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত এক একাডেমিক বিষয় — এই বিতর্কে রাজনীতিকে টেনে আনা ঠিক নয়। এই সার্কুলারে পেং চেন-এর সার্কুলার প্রতিক্রিয়াশীল রূপকে খণ্ডন করে। এর পর থেকেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দুই লাইনের সংগ্রাম মুখোমুখি সংঘর্ষের রূপ নেয়।

আজ ছাত্ররা সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিদ্ধে বুর্জোয়া দাবি জানাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা পর্ব ও বহিরাকৃতির দিক থেকে প্রায় একই রকম ছিল যদিও সেদিনের বিদ্রোহ ও আজকের ছাত্র বিক্ষোভ নেতৃত্ব ও লক্ষ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

২৫মে ১৯৬৬, পিকিং ঝি-বিদ্যালয়ের উপাচার্য লু-পিং-এর আমলাতান্ত্রিক বিদ্ধে ঝিবিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীরা এক বিরাট পোস্টার টাঙিয়ে দেয়। এই পোস্টারে তারা লু-পিং সহ পার্টি নেতৃত্বের একাংশের অপসারণ দাবি করে। মাও-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১ জুন ১৯৬৬-তে পিকিং বেতার এই পোস্টারের বক্তব্য প্রচার করে। এবং তারপরই হাজার হাজার ছাত্র যুব রাস্তায় নেমে পড়ে, অভ্যুদয় ঘটে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মুখ্যনায়ক হুং ওয়েই পিং বা রেড গার্ডদের। পিকিং ও সিনহুয়া ঝিবিদ্যালয় নিয়েছিল সেদিনের বিপ্লবী নেতৃত্ব। প্রথমদিকে দক্ষিণপন্থী আক্রমণে ছাত্ররা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। অবশেষে এল সেই নতুন দিন — ১৯৬৬ সালের ৫ আগষ্ট। মাও-সে-তুং পিকিং ঝিবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমর্থনে নিজে এক পোস্টার লিখলেন, যার নাম দিলেন 'সদরদপ্তরে কামান দাগাও।' এই নতুন বলে বলীয়ান হয়ে বিপ্লবী শ্রমিক ছাত্র-যুবরা ক্ষমতা দখলের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, মাও-সে-তুং গণমুক্তি ফৌজের কাছে বলেছিলেন বামপন্থী ছাত্র-যুবদের পাশে দাঁড়াতে। এবং তিনি তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে এক কোটি দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন। কট্টর দক্ষিণপন্থীদের দপ্তর বিধবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী যোদ্ধারা সেদিন মধ্যপন্থীদেরকে চিহ্নিত করেছিলেন। চৌ-এন-লাই, লি-সিয়েন-দিয়েন, ঝাও-ঝিয়াং, চেন-ইং প্রভৃতিদের বিদ্ধেও সেদিন বিপ্লবী গুত্বপূর্ণ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হলেও শোধনবাদ কখনও স্থায়ী ভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। কিন্তু লিন-পিয়াও হত্যা সংগঠিত করে ১৯৭৫ সালে চীনা পার্টির দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করা অবধি সমস্ত ঘটনায় চীনা পার্টির মধ্যপন্থীদের একটা ভূমিকা রয়েছে। চৌ-এন-লাইয়ের মৃত্যুর পর তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে তার শবাধারে মালা দেওয়া নিয়ে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের বিরোধ বাধে। তেং-শিয়াও-পিংকে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং তথ্যগতভাবে দেখা যায় চীনা পার্টির একাদশ কংগ্রেসে হুয়া-কুয়া-ফেং তার রিপোর্টে মাদাম চিয়াং চিং দের বিদ্ধে বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেও তারা দাবানল জ্বালাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।' আসলে এ সবের মধ্যে দিয়ে তারা আক্রমণের বর্শামুখ তুলে ধরেই প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই, ভাইস চেয়ারম্যান ইয়ে চিয়েন চিং এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীর অন্যান্য নেতৃত্ব স্থানীয় কমরেডদের বিদ্ধেও (একাদশ কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯৭৩)। চীনা পার্টিতে ক্ষমতা দখলের পর চীনের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিগত অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। লিউ-শাও-চিকে মরণোত্তর পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কমরেড স্তালিন এবং চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক ধিক্কৃত মার্শাল টিটোকে মহান মার্কসবাদী লেনিনবাদী বলা হল (পিকিং রিভিউ, সংখ্যা ২৫, ১৯৭৮ এবং সংখ্যা ২০, ১৯৮০)। ইতালির শোধনবাদী নেতা কর্লিন গুয়ারকে তেং হুয়া স্বীকৃতি জানানো (সংখ্যা ১৭, ১৯৮০) সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় দখলিকৃত প্রতিক্রিয়াশীলদের
সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হল (চীনা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত, ২২-২৪ জানুয়ারী, ১৯৮০)। এছাড়াও ১৯৭১ থেকে মার্কিনিদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনও শু হয়। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে আমেরিকার আমদানি-রপ্তানি ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

সাল	আমেরিকা রপ্তানি (লক্ষ ডলার)	আমেরিকা আমদানি (লক্ষ ডলার)	মোট (লক্ষ ডলার)
১৯৭১ ঋ	৪.৯		৪.৯
১৯৭২	৬৩.৫	৩২.৪	৯৫.৯
১৯৭৩	৭৪০.২	৬৪.৯	৮০৫.১

১৯৭৪	৮৭৯.১	১১৪.৭	৯৯৩.৮
১৯৭৫	৩০৩.৬	১৫৮.৪	৮৬২.০
১৯৭৬	১৩৫.৫	২১০.৩	৩৪৫.৪
১৯৭৭	১৭১.৩	২০২.৭	৩৭৪.০
১৯৭৮	৮৩২.৬	৩২৪.১	১১৪৭.৭
১৯৭৯	১৭১৬.৬	৫৯২.১	২৩০৮.৮
১৯৮০	১৮৩৪.২	৬১৭.১	২৪৮১.৩

এই বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের কাজের মধ্যেই কমিউনিজম বিরোধী চিন্তাধারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে এবং তা হয়েছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদতে। তাই তো আর গর্বাচোভের সহাস্য করমর্দনের ছবি দেখে বিস্মিত হন না বিপ্লবীরা। যে স্তালিনকে প্রতিষ্ঠা ও বর্জনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চীন ও রাশিয়া বা মাও এবং ক্রুশ্চেভের দ্বন্দ্ব আজ সেই স্তালিন চীন দেশেও শাসকগোষ্ঠীর মদতে সমালোচিত (Beijing Review Vol.-32, No.-20) এবং এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে ঠিক গর্বাচোভের চীন সফরের প্রাক্কালে। এইভাবে লাল চীন ধীরে ধীরে মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাবিরোধী যে ভূমিকা নিয়েছে আজকের ছাত্র বিক্ষোভকেও এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। সোভিয়েতের সঙ্গে চীনের ভালো সম্পর্ক মার্কিনীরা যে ভালো চোখে দেখে না এই দ্বন্দ্বও চীনে ক্রিয়াশীল।

সোভিয়েত অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি বা পরোক্ষে শোষণ করে যে ভাবে নিজের দেশের আংশিক সমস্যার সমাধান করছে চীনের পক্ষে আজ তা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় নিজের দেশের বেকারি, দারিদ্র, দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি তথা জনগণের বিক্ষোভ সামাল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। এরকমই এক মুহূর্তে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসক তেং দেং চক্রের বিদ্ধে পশ্চিমি প্রভাব ও মদতে পুষ্ট কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং ক্ষমতা অধিষ্ঠিতদের একটা অংশ তাদের আরও ক্ষমতা পাবার লোভে জনতার এই ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে সব থেকে একটি গুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বামপন্থী ছাত্র-যুব বা সাধারণ মানুষদের জাগরণ। চেয়ারম্যান মাও অনেক আগেই বলেছিলেন, যদি চীনে কোনোদিন প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতা দখল করে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস চীনা জনগণ তাদের নির্বিবাদে থাকতে দেবে না।

চীনা জনগণের আছে বহু সংগ্রামী ঐতিহ্য। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারা তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি। আজও তাই বিশ্বাস জাগে যখন খবরে জানি গুলিচালনার চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তেও ছাত্ররা হাত ধরাধরি করে ইন্টারন্যাশনাল গেয়েছেন — তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে যেখানে একদিন মাও ঘোষণা করেছিলেন সর্বহারা গণতন্ত্রের।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com